বিশ শতকের বাংলা নাটকে বিবর্তনের ধারা

ড. অন্তরা চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়,
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

ABSTRACT:-

মানুষের বিশিষ্ট চিত্ত বিনোদনকারী মাধ্যমগুলির মধ্যে নাটক অন্যতম শিল্প মাধ্যম রূপে পরিগণিত হয়। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে নাটক বা মঞ্চনাটক অন্যতম প্রধান স্থান পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের একেবারে আদি লগ্নে বুদ্ধনাটক, নৃত্যগীত, নটপটিকা অর্থাৎ অভিনেতাদের পোশাক পরিচ্ছদ রাখার বাক্সের কথা জানতে পারি। কিন্তু এই সব খন্ড নাটকের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নাটকের রূপ পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ নাটক এসেছে পূর্ব প্রবণতার স্বাভাবিক পরিণতির রূপে নয়, সাংস্কৃতিক ও ইংরেজি নাটকের অনুসরণ-অনুকরণ ও বিলেতি রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জার আকর্ষণে। বাংলা নাটকের প্রথম পর্যায়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ অমৃতলাল বসু এবং দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরসিকতায় ও দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করে একাঙ্ক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন পৌরাণিক ধর্মবোধসম্পূর্ণ নাটকও রচিত হয়েছিল। নাট্য সংলাপে আঞ্চলিকতা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার, গানের ব্যবহার ও সর্বশ্রেণীর কন্ঠে রচিত সঙ্গীত এই মাধ্যমটিকে জনপ্রিয়তার শিখরে উন্নীত করেছে।

বাংলা নাটকের ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করলে একথা স্পষ্ট হয় যে ১৯৪২ সালের পর থেকেই নাটকের নতুন যুগের শুরু হয়। এই বহু বিতর্কিত সময়টি হল নবনাট্যের কাল। সমকালীন যুগের জীবনের জটিলতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতিবোধ যতই পরিত্যক্ত হোক না কেন ভাববাদের সীমা অতিক্রম করে বাংলা নাটকের প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকার অভিনেতা ও কুশীলবরা বাংলা নাটকের বিবর্তনে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করলেন। বিজন ভট্টাচার্যর নবান্ন সমাজ বাস্তবতা ও মননশীলতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। নাটক ও প্রযোজনা নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষায় প্রতিভাধর নাট্যশিল্পীদের আশ্চর্য অভিনয়দক্ষতার পরিচয় মিলে। এই প্রসঙ্গে একাঙ্ক নাটক, নাট্যকাব্য, জীবনী নাটক, বিদেশী অনূদিত নাটক, উপন্যাসের নাট্যরূপও উল্লেখের দাবি রাখে। বর্তমানে অন্তর্রাজ্য ও আন্তর্জাতিক সমস্যাও নাটকের বিষয়বস্তু হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে চরম নৈরাশ্যবাদ ও সামাজিক ও আর্থিক দুরবস্থার কারণে মানুষ পথভ্রষ্ট। এর প্রভাব থেকে নাটকও মুক্ত নয়। তবুও নাটকের মধ্যেই ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ও সমাজ চেতনার ও সমস্ত রকম অন্যায়

ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শিল্পীদের সোচ্চার প্রতিবাদ করতে হবে। তবুও আশা রাখি নাটকের মধ্য দিয়েই সমাজের বিবর্তনও পরিবর্তনের বিজয় পতাকা একদিন উত্তোলিত হবে।

KEYWORDS:- অন্যতম শিল্পমাধ্যম, বিষয় বৈচিত্র্য, জীবনের নব মূল্যায়ন, মানব চেতনার বিশ্লেষণ, সামাজিক দ্বন্দ্ব- সমস্যার প্রতিরূপ।

মূল প্রবন্ধ

নাটক ও নাট্যশালা হলো জাতির দর্পণ। জাতির সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সর্বকালেই প্রতিফলিত হয়েছে নাটকে এবং নাট্যশালায়। আনন্দদানের মাধ্যমে শিক্ষাদানের এমন সার্থক বাহন আর দ্বিতীয়টি নেই। নাটক জীবনশিল্পও বটে, নাট্যকারের চেতনার জগত যেন একখানি দর্পণ। সেখানে বিভিন্ন মানুষের, বিভিন্ন ভাবের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিবিম্ব নিত্য নিয়ত ধরা পড়ছে। নাট্যকারের মানস-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে রং বদলে আলো অন্ধকারের সেই প্রতিবিম্বগুলিও কখনও উজ্জ্বল, কখনও অস্পষ্ট, কখনও সুন্দর-অসুন্দরের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। সেই দর্পণে প্রতিফলনের যেমন শেষ নেই, তেমনই সেই মানসাকাশে রং-বদলের পালাও শেষ হয় না। নাট্যকারের চেতনার এই প্রতিফলন আর প্রতিমননের সংশ্লেষে যে সৃষ্টি রূপ পায় নাটকের মধ্যে, তার বিস্তার আদি ও অন্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েও অনাদি ও অনন্ত। সামাজিক দায়িত্ব পালন করা নাটকের ধর্ম এবং নাটকের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে নতুন আলোর সন্ধান দেওয়াটাই নাট্যকারের মহান দায়িত্ব। আধুনিক বাংলা নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। নাটকের চরিত্রগুলিও সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে।

বস্তুতঃ ইংরেজি নাটকের অনুসরণেই বাংলা নাটক বা নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠেছে। সেই কারণে বাংলা নাটকে পাশ্চাত্য আদর্শের সুগভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপীয় নাটক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সমাজজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। বার্নাড'শ, পিরানদেল্লো, ব্রেখট্, স্যামুয়েল বেকেট, আর্থার মিলার প্রভৃতি নাট্যকারেরা নাটকের মাধ্যমে সমাজের সমস্যা, ব্যক্তিগত সমস্যা, আদর্শ ও রাজনৈতিক সমস্যা তুলে ধরেন।

নাটকের আঙ্গিকে, দৃশ্যসজ্জায়, নাটকের পাত্র-পাত্রীর বেশভূষায় , মঞ্চসজ্জায় নানাবিধ পরিবর্তন আনলেন। পঞ্চাঙ্ক নাটকের ঐতিহ্য লুপ্ত হল। সংলাপে পদের স্থানে গদ্য প্রধান বাহন হলো। রঙ্গমঞ্চে আলো, সংগীত, বিভিন্ন ধ্বনির প্রয়োগ এর দ্বারা নতুন নতুন পরীক্ষা শুরু হল। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে দর্শকের নিবিড় যোগ সাধিত হল। অনেক ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চ দর্শকদের বসবার জায়গাতেও সম্প্রসারিত হলো। সূত্রধর বা টীকাকারের সাহায্যে নাটকের অনেক ভাষ্য বলে দেওয়ার রীতি পুনরায় প্রবর্তিত হল । বাংলা নাটকও পাশ্চাত্য নাটকের এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাদরে গ্রহণ করলো।[১]

এ প্রসঙ্গে বাংলা একাঙ্ক নাটকের সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলায় নাট্যাভিনয় ও রচনা, চৈতন্য-যুগ থেকে উত্তর-পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত হলেও একাঙ্ক নাটকের পরিচয় তখনও দুর্লভ। রূপ গোস্বামীর একাঙ্ক "জলকেলী কৌমুদী" বাদ দিলে একাঙ্ক নাটকের প্রকৃত রূপ সে যুগে অনুপস্থিত।

একাঙ্ক নাট্যসাহিত্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক মননের ফসল । বাস্তব জীবন-যন্ত্রণা থেকে এর অসামান্য আবির্ভাব। সুন্দর, ঐশ্বর্যদীপ্ত জীবন যখন সংশয়ে দ্বিধান্বিত, বিষন্নতায় ম্লান, যন্ত্রণা ও আঘাতে বিদীর্ণ ও রক্তাক্ত তখন সেই সংশয়াবৃত জীবনদ্বন্দ্ব নিবিড় সাহিত্যে একাঙ্কিকার শিল্প-রূপকে বরণ করে নেয়। বিশ্বসাহিত্যে একাঙ্কিকার আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। জীবনের বেদনা-আঘাত-জটিলতা অপসারিত হয়ে একটি তীক্ষ্ণ একমুখিনতা উজ্জ্বল হতে থাকে-সেই উপলব্ধির প্রকাশ একাঙ্ক নাটক। একাঙ্কিকার আবির্ভাব-লগ্নে বিরাজ করে মানুষের অর্থ-সামর্থ্য ও সময়-পরিমিতি। উপযুক্ত সামাজিক ও মানস পরিবেশের উদ্ভব ঘটেছে বাংলার ১৯-২০ শতকে। আর তখনই বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটকের আবির্ভাব।

বাংলা একাঙ্ক নাটকের প্রথম পর্যায়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাস্যরসিকতাকে অবলম্বন করে একাঙ্ক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই পর্বে একাঙ্ক নাটকে বৃহত্তর ও মহত্তর জীবন-ভাবনা অনুপস্থিত । যদিও গিরিশচন্দ্রের ‘সপ্তমীতে বিসর্জন’, ‘বড়দিনের বকশিস’, ‘বেল্লিক বাজার’ প্রভৃতি একাঙ্ক নাটকে প্রকৃত হাস্যরসের পরিবর্তে রুচিহীন ভাঁড়ামি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তাঁর রচিত ও অভিনীত নাটকগুলি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গিরিশ চন্দ্রের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও অনূদিত নাটকগুলি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে গৌরবময় ভূমিকা পালন করে। তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে সমকালীন সমাজ সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনোত্তর কালে রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলির সাহায্যে তিনি জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ ও বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছেন। গীতিনাট্যের মাধ্যমে তিনিই সর্বপ্রথম আরব-পারস্যের কাহিনীকে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে নিয়ে এসেছেন। পৌরাণিক নাটকগুলিতে তিনি সাধারণ লোকশিক্ষা প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন। সমকালীন হিন্দু-বাঙালির ধর্মবোধ তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিতে পরিতৃপ্ত হয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণীতে উদ্‌বুদ্ধ বাঙালি সমাজের ভক্তিতৃষ্ণা নিবৃত্ত করেছেন তিনি। নাটকের সংলাপ ও সংগীত রচনায়ও গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব অপরিসীম। কলকাতার অঞ্চলবিশেষের ভাষা সরসতা ও সজীবতা লাভ করেছে তাঁর হাতে। কালীপ্রসন্নের ‘হুতোম প্যাঁচার নকশায়’ ব্যবহৃত গদ্যভাষাকে বলিষ্ঠ সংলাপের ভাষায় পরিণত করেছেন গিরিশচন্দ্র। পদ্য-সংলাপের ক্ষেত্রে তাঁর হাতে জন্ম হয়েছে ‘গৈরিশ ছন্দের’। মধুসূদন নাট্যসংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন সফল হয়ে উঠল গিরিশচন্দ্রের হাতে। জনপ্রিয় নাট্যসংলাপের জন্ম দিলেন তিনি। সংগীত রচনাতেও গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর সমস্ত সংগীতই নাট্যবিষয়ের উপযোগী। বেদে, চোর, মাঝি, মাতাল প্রভৃতি নানা চরিত্রের কন্ঠে সংগীত তুলে দিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যে সংগীতের এক অনন্ত সম্ভাবনা জাগিয়ে তুললেন।[২]

গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলার জেলায় জেলায় এবং বাংলার বাইরে নাট্যআন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তাঁর এ ভূমিকাটিতে তিনি যে আপনকালের অগ্রবর্তী তাই প্রমাণিত হয়েছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের এক সংকটক্ষণে আবির্ভূত হয়ে বাংলার মঞ্চ ও নাট্যজগতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন গিরিশচন্দ্র। তাঁর সে প্রভাব সুদৃঢ়কাল অক্ষুন্ন থেকেছে, প্রায় নবনাট্য আন্দোলনের সূচনাকাল পর্যন্ত। নাট্যকাররূপে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব সমালোচনার অপেক্ষা রাখে ঠিকই, কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যে ও মঞ্চজগতে তাঁর প্রেরণা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় দিক থেকেই যে তাৎপর্যপূর্ণ ও স্বর্ণপ্রসূ তাতে কোনরূপ সন্দেহ থাকে না। বস্তুতঃপক্ষে বাংলা নাট্য ও মঞ্চজগতের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র একাকী একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ, একটি সমগ্র যুগের প্রতিভূ।[৩]

অমৃতলাল বসুর একাঙ্ক নাটকগুলি উন্নত প্রতিভার সৃষ্টি। তাঁর 'ডিসমিস্', 'নবজীবন', 'চাটুজ্যে-বাড়ুজ্যে' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটক। তাঁর 'খাসদখল' এ হাস্যরসের সঙ্গে করুণ রস মিশ্রিত হয়েছে। 'বিবাহবিভ্রাট' ও 'চাটুজ্যে-বাড়ুজ্যে' তে সামান্য ব্যঙ্গের ভঙ্গি থাকলেও প্রধানত অনাবিল হাস্যরসের ধারাই বর্তমান আছে।[৪]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি। প্রধানতঃ মুঘল ও রাজপুতদের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তিনি 'তারাবাঈ', 'দুর্গাদাস', 'মেবারপতন' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। বিশেষ করে, 'মেবারপতন' এ বিশ্বমানব মৈত্রী এবং জাতীয়তাবাদের দুটি আদর্শকে তিনি সমন্বিত করবার চেষ্টা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকগুলি 'পাষাণী', 'সীতা', ও 'ভীষ্ম' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে তিনি অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি জনপ্রিয় হবার একটি কারণ হল নাটকের মধ্যে সঙ্গীতের ব্যবহার। তাঁর জাতীয়তাবাদী সংগীতগুলির ওজস্বিতা ও মানবিক আবেদন স্বদেশপ্রেমের একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি।[৫]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এর শ্রেষ্ঠত্ব নাটক বা ব্যঙ্গরচনার মধ্যে সীমিত নয় । তা মূলত কল্পনাপ্রধান গীতিনাট্যে। এই জাতীয় রচনার মধ্যে আলিবাবা ও বরুণায় কল্পনা, দক্ষ ঘটনাবিন্যাস, গান ও সংলাপের সুষ্ঠু মিশ্রণ ও নাটকোচিত সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এই দুটি গীতিনাট্যকে বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিশেষ স্থান দিয়েছে। তাঁর 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য', 'পদ্মিনী', 'চাঁদবিবি', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত নাটকে স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা একাঙ্ক নাটকের জন্মলগ্নে উল্লিখিত নাট্যকারদের অবদান স্মরণীয়।

গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নাট্যকারদের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন থাকলেও সমাজবিকাশের অগ্রগতির ফলে বাঙালি নাট্যকারেরাও ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা সামাজিক নাটক রচনায় পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করতে পারলেন না। তাঁরা নাটককেও সমাজজিজ্ঞাসা ও চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করতে চাইলেন, নাটককে করতে চাইলেন জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার, আত্মজিজ্ঞাসার বলিষ্ঠ বাহন। একথা সত্যি যে

উক্ত শতকেও রবীন্দ্রনাথও বেশ কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন। 'মুক্তধারা' নামক রূপক নাট্যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণব্যবস্থাকে ধিক্কার জানানো হয়েছে। অন্যান্য নাটকে আধুনিককালের মানবজীবনের মুক্তির সমস্যাটি নানা দিকে থেকে আলোচিত হয়েছে। বিদেশি শাসন ও শোষণমুক্তি তার অঙ্গ হিসেবেই দেখা গিয়েছে ; কোথাও স্বতন্ত্র হয়ে প্রধান হয়ে ওঠেনি। এই নাটকগুলি মঞ্চনাটক রূপেও বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তাই বাংলা নাট্যকাররা নতুন কিছু গড়বার সংকল্পে গড়ে তুললেন নবনাট্য আন্দোলন। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, প্রয়োগ-পরিকল্পনা সর্বক্ষেত্রেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখা দিল। নতুন নতুন নাট্যগোষ্ঠী আবির্ভূত হলেন। পেশাদার নাট্যমঞ্চের সীমাবদ্ধ গণ্ডি অতিক্রম করে বাংলা নাটক মুক্তাঙ্গন, মাঠে-ময়দানে অভিনীত হতে থাকলো। বাংলা নাটকের নতুন জীবন ও জোয়ার দেখা দিল।[৬]

বাংলা নাটকের ধারাবাহিক ইতিহাসকে যদি অনুসরণ করা যায় তবে মানতে হবে যে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই বাংলার নাটকের ইতিহাসে একটা নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। প্রবহমান স্রোতের এই আধুনিকতম বাঁকটি হল বহু বিতর্কিত নবনাট্যের কাল।

সমকালের যুগ ও জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা যত বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের পাকচক্রে জীবন ততই জটিল ও কন্টকিত হয়েছে। মূলবোধের রূপের ও নীতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। বিগতকালের ধ্যান-ধারণা, নীতিবোধ, মেজাজ নবযুগের সমাজের শিল্প সাহিত্যিকদের মননের জগতে যতই বাধা সৃষ্টি করুক না কেন ততই আত্মপ্রত্যয়বান শিল্পীরা জীবনের রহস্যময় প্রকাশের নবতর নিরিখের অন্বেষার কল্পনাবিলাস অথবা মধ্যবিত্ত জীবনসুলভ ভাববাদের সীমা অতিক্রম করে বাস্তবমুখী হতে চেয়েছেন যা ক্রান্তিকালের জীবনদৃষ্টি বা জীবনচেতনা। ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় নৃত্যগীত সম্বলিত নাটক বা অভিনয় পরিত্যাগ করে আধুনিক শিল্পী হয়েছেন "রিয়ালিজম" এর উপাসক। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনের সুদৃঢ় সংহতির মধ্য দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির নবমূল্যায়ন প্রচেষ্টায় শিল্পী তার সৃষ্টির সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন।[৭]

যখন পেশাদারী মঞ্চের সময় বা কাল পৌন:পুনিকতার মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল,যখন একই ধরনের চিন্তা, বিষয়বস্তু নাটকের বা থিয়েটারের দলগুলিকে ক্লান্ত করে তুলেছিল, তখন যেকোনও ধরণের অঙ্কুশের আঘাতেই হোক না কেন, বেশ কিছু সংখ্যক সমাজ-সচেতন শিল্পীর সৃষ্টির প্রেরণা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সেই সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এমন একটি নবসৃষ্টির প্রেরণা বা প্রয়াস কালকেই নবনাট্য কাল বলা যেতে পারে। এই পরিবর্তিত নাট্যকলার রূপায়বে এই নতুন রিয়ালিজমের জগতে উত্তরণের প্রত্যয় দৃপ্ত ও দীপ্ত ভঙ্গিতে প্রকাশিত। একালের নাট্যকলায় যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনচেতনার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ার পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক পথে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ, সাধারণ মানুষের ধ্যানধারণা, তাদের স্বপ্ন, কল্পনা, আশানিরাশার যথাযথ রূপায়ণ প্রতিষ্ঠা ও সমকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উত্থান-পতন কে জীবনের সঙ্গে বিধৃত করে তার সার্থকতার অনুসন্ধানে একান্ত আগ্রহান্বিত হওয়া । এ বিষয়ে বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিও অনেকাংশে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বাংলা নাটকের মধ্যযুগ বা আধুনিক যুগের প্রথম পর্বের নাট্যবোধের সঙ্গে এই নবতর দৃষ্টির নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য লক্ষ্য করেই সাম্প্রতিক যুগ থেকেই বাংলা নাটকের বিবর্তনের ধারাটি শুরু হয়েছিল।

বাংলার নবনাট্য আন্দোলন বা নাটকের বিবর্তনের যুগটির সম্বন্ধে আজ বিবৃত প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। তখন রাজনৈতিক পরিবেশও এই ধারার নাটকের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। যে সময় এই নবনাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাকে যুদ্ধোত্তর স্বাধীনতা যুগ বলা চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ১৯৪২ সালে স্বার্থান্ধ যুদ্ধবাজ সরকারের চক্রান্তে মনুষ্যসৃষ্ট মহামন্বন্তর ঘটে। ১৯৪৭ সালে এল দেশবিভাগজনিত স্বাধীনতা। মহামন্বন্তরের মহামারীতে হতভাগ্য পঞ্চাশ লক্ষ নরনারী অনাহারে অনশনে মৃত্যুবরণ করল। যুদ্ধ, মহামন্বন্তর দেশ, বিভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যায় জাতির জীবনে নেমে এলো মহাসংকট। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সমস্যার সম্মুখীন হল। সরকারি প্রচেষ্টায় শিল্প সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক আন্দোলনও জোরদার হয়ে উঠলো। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হলো বটে কিন্তু ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যা সঙ্গে সঙ্গে দূর হলো না। একান্নবর্তী পরিবারগুলি বিভক্ত হলো। বিভিন্ন কারণে মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনে এল একটি নতুন পরিবর্তন। বিধবা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, স্বার্থ বিবাহ প্রভৃতি আইন বা সামাজিক পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে অধিকতর ফলপ্রসূ হতে লাগলো। দেশবিভাগের ফলস্বরূপ পূর্বভঙ্গের ছিন্নমূল মানুষদের পুনর্বাসন সমস্যা ও সর্বোপরি বেকার সমস্যা তীব্র হয়ে উঠলো। ব্যক্তি সমস্যা ক্রমে শ্রেণী সমস্যায় পরিণত হতে লাগলো। অসন্তোষ-বিক্ষোভ এবং শ্রেণীস্বার্থ সংঘাতে বাংলায় তুমুল বিপর্যয় দেখা দিল।[৮]

যুগসন্ধিক্ষণের এই চরম মুহূর্তে প্রকাশিত হলো বিজন ভট্টাচার্যের "নবান্ন" (১৯৪৪)। সমাজ বাস্তবতা ও মননশীলতার এক নবজীবন দর্শন। ১৩৫০ এর মন্বন্তরের নিদারুণ বিভীষিকা, সমাজ জীবনের বিপর্যয়, পুরাতন জীবনের ভাঙ্গন ও নবজীবনের স্বপ্ন নাটকটির বিষয়বস্তু। মঞ্চ আঙ্গিকেও নুতনত্ব পরিলক্ষিত হয়। আলোকসম্পাত ও শব্দক্ষেপণের বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করে দৃশ্য-পরিবেশ ও ভাব-পরিবেশ গঠনের প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। বাস্তবধর্মী নাটকে অর্থনৈতিক বৈষম্য এত তীব্রভাবে আর কোনও বাংলা নাটকে উপস্থাপিত করা হয়নি। দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকের সঙ্গেই "নবান্ন" নাটকের একমাত্র তুলনা চলে। ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সাংস্কৃতিক শাখা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (I.P.T.A) কর্তৃক অভিনীত এই সমাজ-সচেতন নাটকটি বাংলার নাট্যজগতে প্রবল সাড়া জাগিয়েছিল। যদিও নাটকটির কাহিনীবৃত্ত সুগ্রথিত নয়, চিত্রগুলি বাস্তব ও নাটকীয় সংঘাতে পূর্ণ কিন্তু তৎসত্ত্বেও অখন্ড রসসৃষ্টি সম্ভবপর হয়নি। তবুও এই নাটক এক যুগসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করল।

বিজন ভট্টাচার্যের অপর প্রসিদ্ধ নাটক "গোত্রান্তর"। একজন উদ্বাস্তু স্কুল শিক্ষক সপরিবারে কিভাবে ভদ্র মধ্যবিত্ত জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে বস্তিবাসী শ্রমিকজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠলেন তারই বাস্তব কাহিনী নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট ও পরিত্রাণ বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে

'নবান্ন' নাটকের মতই এখানেও শিল্পগত নানা ত্রুটি দেখতে পাওয়া যায়। আকস্মিকতা, অসম্পূর্ণতা ও প্রচারসর্বস্বতা নাটকটিকে রসোত্তীর্ণ হতে দেয়নি। তবে এইসব দুর্বলতা সত্ত্বেও আধুনিক নাট্য সাহিত্যে বিজন ভট্টাচার্যের যে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে যা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সুগভীর সমাজ চেতনা এবং প্রগতিমূলক চিন্তাধারার সাহায্যে আধুনিক নাটককে প্রাণবন্ত করার প্রয়াসে তিনিই প্রথম সার্থকতা লাভ করেন। তাঁর 'জীয়ন কন্যা', 'দেবীগর্জন', 'গর্ভবতী জননী' সেই ধারারই নতুন সম্প্রসারণ।[৯]

এই প্রসঙ্গে একাঙ্কনাটক, নাট্যকাব্য ও জীবনীনাটক, অনূদিত নাটক, উপন্যাসের নাট্যরূপও বিশেষ উল্লেখ এর দাবি রাখে। ১৯২৩ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর স্টার থিয়েটার 'সবুজপত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর প্রশংসাধন্য মন্মথ রায় প্রণীত একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' অভিনয় করে একাঙ্ক নাটকের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, আজ পর্যন্ত তা বহু প্রতিভাশালী একাঙ্ক নাটক রচয়িতার সাধনার উর্বরস্থান তো বটেই, শস্য শ্যামলও বটে।[১০]

এই পর্বে একাঙ্ক নাটক রচিয়তাদের মধ্যে প্রমথ বিশী মূলতঃ ব্যঙ্গশিল্পী। সমাজের বিকৃতি তাঁর তীক্ষ্ণ আঘাতে জর্জরিত হয়। তাঁর স্মরণীয় একাঙ্ক নাটক 'পশ্চাতের আমি'। যৌবনে খ্যাতি এবং ঐশ্বর্যের উন্নত শিখরে পৌঁছেও কিভাবে মানুষের অবদমিত কামনা তাকে বিপর্যস্ত করে তোলে তা-ই আলোচ্য একাঙ্কের বিষয়বস্তু। নায়ক অরবিন্দের অপ্রাপনীয়ার জন্য ব্যাকুল বেদনাদীর্ণ সত্তার নিঃশেষিত ক্রন্দন সত্যিই মর্মদাহী।

অচিন্ত্য সেনগুপ্তর 'নতুন তারা' একাঙ্কে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে রোমান্টিক বোধের উচ্ছ্বাস আছে। 'উপসংহার' একাঙ্কে তারাপদ চরিত্র জীবনের লাঞ্ছনাবেদনা ও অসহায়তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছে।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সীমিতভাবে একাঙ্ক নাটক রচনা করলেও সেগুলি আধুনিক জীবন সমস্যার প্রতিরূপ। 'রাজধানীর রাস্তা'য় নাটিকায় ভয়াবহ মন্বন্তরের করাল চিত্র, মানুষের বাস্তব স্বার্থান্ধ রূপ, সভ্যতার অন্তরালে বিকৃত কুটিলতা, একমুঠো অন্নের প্রত্যাশায় সমবেত মানুষের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা সবই নাট্যকারের দৃষ্টিতে প্রকাশিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মাধ্যমে সর্ব রিক্ত মানুষ ভাস্বর হয়ে ওঠে।

পরিমল গোস্বামীর একাঙ্ক নাট্যগুচ্ছ কৌতুকরস রসিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন। আপাত কৌতুকের অন্তরালে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতির রূপ উদ্ভাসিত। 'ঘুঘু' , 'গৃহিনীর শাড়ি', 'ময়ূরপুচ্ছ কাক', 'দন্তপ্রলয়' প্রভৃতি একাঙ্ক রসভাবনায় সুন্দর। মানব চিত্তের অসংলগ্নতা উপাদেয়, সমাজ-সমস্যার প্রতিভাসে তীক্ষ্ণ।[১১]

নন্দগোপাল সেনগুপ্তর 'সহোদর', 'ধর্মঘট', 'ভদ্রলোক', 'বুভুক্ষা', প্রভৃতি বিখ্যাত একাঙ্ক। 'সহোদর' নাটিকায় ভ্রাতৃভাবনার অন্তরালে কপটতা, 'ধর্মঘট' নাটকে ধনিক শ্রেণীর অত্যাচার, শোষণ, কপট মানবপ্রীতির উদাও পরিচয় প্রকাশিত। 'ভদ্রলোক' ও 'বুভুক্ষা' নাটিকায় মন্বন্তর ও শোষিত জীবনের যন্ত্রণা আছে।তাঁর 'ঘোরানো সিঁড়ি' 'আধিভৌতিক' ও 'বুভুক্ষা' শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক। অখিল নিয়োগীর একাঙ্ক নাটকে সহজ শিল্পরূপের পরিচয়

লভ্য। 'সাজঘর' নাটিকায় অভিনেতার জীবনের ট্রাজিক রূপ উদ্ভাসিত। 'ড্রপ ওঠার আগে' নাটিকায় হতভাগ্য লেখকদের করুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' নাটকটি শিল্প সৃজনের বৈচিত্র্যে অসামান্য। বৈষ্ণব সমাজের পরিবেশের পটভূমিকায় এই কাহিনীর অবস্থান। গোবিন্দদাসের প্রেমতৃষ্ণা ভাগ্যের প্রতিকূলতায় ট্রাজিক মৃত্যুতে পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থতা ও হাহাকার আতঙ্ক ও ভীতি রহস্য প্রকট করে। 'না' নাটকে দুই অসম বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী কিভাবে পরস্পরের ঈর্ষার পাত্র হয় ও চরম পরিণতিতে একটি হত্যাকাণ্ডে সমাপ্ত হয় তারই করুন বিধুর কাহিনী। 'দুই পুরুষ' নাটকে দুটি প্রজন্মের পার্থক্য ও মূল্যবোধের পরিণাম দেখান হয়েছে।[১২]

এই পর্যায়ে আরও একজন একাঙ্ক রচয়িতা হলেন বনফুল। বনফুলের জীবনবোধ গভীর ও অর্থবহ। তাঁর লেখা নাটকে সংঘাতময় জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্বকে রূপায়িত করেছেন। তাঁর একাঙ্ক সংকলনটি হাস্যরসিকতার অসামান্য নিদর্শন। 'শ্রীমধুসূদন' ও 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' নাট্যরূপটি বেতার ও মঞ্চসফল নাটক। শিককাবাব নাটকে নারী লোভাতুর বীভৎস মানুষের জান্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন।

বাংলায় একাঙ্ক নাটকের প্রধান ঋত্বিক মন্মথ রায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা একাঙ্ক নাটক তার নিজস্ব পথ খুঁজে পায়। সৃষ্টির বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্যে তাঁর একাঙ্ক সাহিত্য সমৃদ্ধ। তিনি বাংলা একাঙ্ক নাটককে স্বমহিমায় স্থিত করেছেন। মন্মথ রায়ের প্রথম একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' তদানীন্তন দর্শকমহলে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চার করে। তাঁর লেখা শতাধিক নাটক মুক্তসদৃশ। ১৩৩২ সাল থেকে ১৩৩৬ সন পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় মন্মথ রায়ের একাঙ্ক নাটক রচনার শ্রেষ্ঠ যুগ। 'রাজপুরী', 'লক্ষহীরা', 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'টিয়া', 'বসুন্ধরা', 'উপচার', 'ভূমিকম্প' প্রভৃতি একাঙ্ক শিল্পভাবনার অত্যুচ্চ প্রকাশ। 'বিদ্যুৎপর্ণা' মন্মথ রায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক। বৈষ্ণব মহান্ত বেদেনী শিশুকন্যাকে ক্রমিক বিষদানে বিষকন্যায় পর্যবসিত করে। তারপর কিভাবে সুতীব্র ট্রাজেডিতে তাঁর তাপদগ্ধ জীবনের নির্মম পরিসমাপ্তি ঘটে তাই-ই এই আলোচ্য নাটকটি বিষয়। তাঁর 'উল্কাপাত' বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'মানুষের কামড়ে', 'ভূভার হরণ কর্পোরেশন', 'শেষ সংবাদ', 'গৃহরাজ্য', 'একটিন বার্নিশ' প্রভৃতি নাটকে কৌতুক ব্যঙ্গের কথায় তিক্ততা ও নিপীড়িত মানব-আত্মার যন্ত্রণা প্রতিফলিত। তাঁর একাঙ্কগুলিতে জীবন-অনুভূতি, বেদনা, তীব্র আবেদন শিল্পবোধ ও হৃদয়ের সুগভীর উচ্ছ্বাস প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর জীবননিষ্ঠ শিল্পিসত্তার প্রকাশরূপে একাঙ্ক নাটকগুলিকে বিস্ময়কর রচনায় পর্যবসিত করেছে।[১৩]

বিশ শতকের চতুর্থ দশককে বাংলার একাঙ্ক নাটকের স্মরণীয় অধ্যায় বলা যেতে পারে। পূর্ববর্তীকালের একাঙ্ক নাটকে শিল্পরূপের বর্ণাঢ্য পরিচয় লভ্য হলেও সেখানে গভীর অনুধ্যান, নিপুণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, সমাজ ও জীবন সত্যের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান ইত্যাদি অনুপস্থিত। চতুর্থ দশকের পরবর্তী একাঙ্ক নাটক মননের যন্ত্রণায়, সংগ্রামী মনোভাবে ও মুক্তির ঘোষণায় উদ্বেলিত।

পেশাদার নাট্যশালার বাইরে অপেশাদার নাট্যসংঘও যে জনচিত্তজয়ী অভিনয়ে সমর্থ এই কথাটা আবার নতুন করে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী গঠনের জোয়ার এসে গেল দেশে। খ্যাতিহীন, পরিচয়বিহীন, সহায় সম্পদশূণ্য নাট্যশিল্পীগোষ্ঠীর প্রাণের ঐশ্বর্যে ও নিষ্ঠার সম্পদে ছেঁড়া চট ঘেরা প্রাঙ্গণে বা মুক্তাঙ্গনে সেদিন গড়ে উঠেছিল নবনাট্যের এক নতুন আদর্শ। শুরু হল নব-নাট্য আন্দোলন। যুগসত্যকে রূপায়িত করে, যুগমানস প্রতিফলিত করে নাট্যকারেরা লিখতে শুরু করলেন যুগোপযোগী নাটক। নাটক ও প্রযোজনা নিয়ে শুরু হল নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা আর এতেই আমরা ক্রমে ক্রমে পেতে লাগলাম বহু মননশীল নাট্যকার, প্রতিভাধর পরিচালক, রূপদক্ষ কুশীলব,ঐন্দ্রজালিক রূপশিল্পী সর্বোপরি সৎ মানুষের নতুন জীবনবোধের সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবন গঠনের মহৎ প্রয়াস। এই পর্বে পর্বে যুগধর্মী সব নাট্য আন্দোলনে কয়েকটি নাট্যকর্ম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এই পর্বে তুলসী লাহিড়ী ও দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা একাঙ্ককে অসামান্যতায় মন্ডিত করেছেন। খ্যাতনামা নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। মনন, চিন্তন ও কর্মধারায় তিনি বাংলা নাট্য আন্দোলনকে নবজীবনের প্রাণস্পন্দনে উজ্জ্বল ও মানবিক সংবেদনায় অপরিমেয় গভীরতা প্রদান করেছেন। ‘পথিক’, ‘ছেঁড়াতার’, ‘দুঃখীর ইমান’, ‘লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার’ তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক । একাঙ্ক সঞ্চয়নে প্রকাশিত দেবী ও দুঃখীর ইমান তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। তবে নাটকের শেষে মনুষ্যত্বেরই জয়গান আভাসিত হয়েছে।

বাংলা নাট্যজগতে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি বৈদগ্ধ্যপূর্ণ অনেক নাটক রচনা করেছেন। ‘অন্তরাল’, ‘তরঙ্গ’, ‘বাস্তুভিটা’, ‘মোকাবিলা’, ‘মশাল’, ‘জীবনস্রোত’ প্রভৃতি নাটক ভাববিলাসহীন বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধোত্তর বাঙালিজীবনে যেসব প্রশ্ন ও সমস্যার আবর্ত দেখা দিল, সেগুলিই তাঁর নাটকে বলিষ্ঠ রূপরেখায় অঙ্কিত হয়েছে। আর্থিক সংকট, শ্রমিক ও মালিক বিরোধ, মেকী জাতীয়তা, সম্প্রদায়িক ঈর্ষা দ্বন্দ্ব প্রভৃতি অনিবার্য রূপেই তাঁর নাটকে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রগতিশীল সম্পাদকের জীবনে ট্রাজেডি প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর মননদীপ্ত একাঙ্ক ‘পান্ডুলিপি’তে। তাঁর স্মরণীয় একাঙ্ক ‘কেউ দায়ী নয়’ কাহিনীর অভিনবত্ব ও নাটকীয় গতিশীলতার জন্য বিখ্যাত। ‘পূর্ণগ্রাসে’ জমিদার ও বস্তিবাসীর সংঘাত, ‘গোলটেবিল’-এ মালিক কর্তৃক সম্পাদকের সঙ্গে ব্যবহার, ‘কাঁঠালের আমসত্ত্ব’ একাঙ্কিকায় ভারতের দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত। বর্তমান নাগরিক-জীবনের যন্ত্রণা- জর্জর নিঃসঙ্গতা, দুঃখবোধ ও মানবিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাঁর স্বচ্ছ ও অকুণ্ঠ মতবাদ নাটকগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। নাটক রচনা তাঁর পক্ষে আর্টের ললিত বিলাস নয়, তা দুঃখব্রত সত্যানুসন্ধান। পরিবেশ রচনা, বাস্তবানুগ সংলাপ-প্রয়োগ আবেগ-দ্বন্দ্বের বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্য এবং ক্ষিপ্র গতিশীল ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর নাটকে সার্থক নাট্যরস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।[১৪]

সলিল সেন "নতুন ইহুদি", ‘মৌচোর’, ‘ডাউন ট্রেন’, ‘দিশারী’, ‘দর্পণ’, ‘স্বীকৃতি’- প্রভৃতি নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর নাটকগুলি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ‘নতুন ইহুদী’ নাটকটি ছিন্নমূল নরনারীদের দুঃখ দুর্বিপাক নিয়ে লিখিত। একটি মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবার এবং তারই সঙ্গে স্নেহ -মমতার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া একটি প্রান্তিক কৃষক পরিবারের কাহিনী নাটকের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এই সুখে শান্তিতে বসবাস করা একটি গ্রাম্য নীড় হিংস্র কুটিল ঝড়ের মুখে পড়ে কিভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তারই মর্মান্তিক দৃশ্য উপস্থাপনা করা হয়েছে নাটকটির মধ্যে। ‘ডাউন ট্রেন’ নাটকটিতে একটি অভাবী স্টেশনমাস্টারের অন্তর্দ্বন্দ্ব যথার্থই নাটকীয়, তা দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করে। ঘটনার মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা ও অসঙ্গতি থাকলেও বাস্তব রসের নাটক হিসেবে এটি একটি মঞ্চসফল ও উল্লেখযোগ্য নাটক।

এ কালের নাট্য জগতে একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ধনঞ্জয় বৈরাগী । এটি তাঁর ছদ্মনাম। আসল নাম তরুণ রায়। তিনি ও তাঁর স্ত্রী দীপান্বিতা রায় একসঙ্গে বহু নাটকে অভিনয় করেন। নাট্য আন্দোলনের অগ্রগতি সাধনে ও সাম্প্রতিক উত্তাল প্লাবনের মূলে ধনঞ্জয় বৈরাগীর অবদান অসামান্য। তাঁর ‘থিয়েটার সেন্টারে’র অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা নাট্যমোদী মানুষ চিরদিন স্মরণে রাখবে। ‘নাট্যগুচ্ছ’ তাঁর একাঙ্ক নাট্যসংকলন। এতে রয়েছে নয়টি উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক। তার মধ্যে ‘ধৃতরাষ্ট্র’, ‘এক মুঠো আকাশ’, ‘রুপোলি চাঁদ’, ‘এক পেয়ালা কফি’, ‘রজনীগন্ধা’, ‘আর হবে না দেরি’, ‘কেঁচো খুঁড়তে কেউটে’ প্রভৃতি নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সামাজিক প্রেক্ষাপট থাকলেও তার নাটকের মূল আবেদন রোমান্টিক, এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। তাঁর নাটকে ঘটনার ঘনঘটা লক্ষিত হয়। বিশেষ করে ‘কেঁচো খুঁড়তে কেউটে’ গোয়েন্দা কাহিনীর রহস্যরোমাঞ্চের স্বাদ দিয়েছে। দৃশ্য সংস্থাপনা, সংলাপ রচনায় তিনি প্রচলিত ধারাকেই অনুসরণ করেছেন।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় প্রধানতঃ পাশ্চাত্য নাটকের অনুসরণে কয়েকখানি বাংলা নাটক রচনা করেছেন। এই নাটকগুলি পাশ্চাত্য নাটকের ভাবমাত্র অবলম্বন করে বাঙালি সমাজ জীবনের পটভূমিকাতেই রচিত হয়েছে। সাঙ্গীকরণের ব্যাপারে অজিত গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ ধরনের নাটক হচ্ছে ‘হেড্ডা গ্যাবলা’র অবলম্বনে ‘শকুন্তলা রায়’, দস্তয়ভস্কির "ইডিয়ট"অবলম্বনে ‘নির্বোধ’, রিচার্ডসনের ‘ফর আওয়ার মাদার মালয়’ অবলম্বনে ‘মালয় মায়ের ডাক’, জে.বি.প্রিস্টলির ‘অ্যান ইন্সপেক্টর কলস্’ অবলম্বনে ‘থানা থেকে আসছি’ প্রভৃতি। এরমধ্যে ‘থানা থেকে আসছি’ সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্য রচনা। অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের মৌলিক রচনা "নচিকেতা"। প্রাচীন ভারতীয় জীবন সাধনার মধ্য থেকে নাট্যকার এখানে একটি চিরকালীন জীবনসত্যের সন্ধান পেয়েছেন।[১৫]

আধুনিক নাট্যজগতে উৎপল দত্ত একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি নাটককে গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে রঙ্গমঞ্চে তাকে রূপে-রসে মূর্ত করে তুলেছেন । তাঁর অনেক নাটকে সাম্যবাদের প্রচার লক্ষ্য করা যায়। দ্বান্দ্বিক

বস্তুবাদকে অবলম্বন করে তিনি যেভাবে তাঁর নাটকাবলীকে গড়ে তুলেছেন তা অন্য কোনও নাট্যকারের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। 'ছায়ানট', 'বিচারের বাণী', 'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ', 'রাতের অতিথি','কল্লোল', 'মানুষের অধিকারে', 'ব্যারিকেড', 'দুঃস্বপ্নের নগরী', 'টিনের তলোয়ার', 'নীলকণ্ঠ', 'ঘুম নেই' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত নাটক। 'নীলকণ্ঠ' একাঙ্কিকায় পুঁজিবাদের নগ্নতা এবং 'ঘুম নেই' একাঙ্কে নিম্নবিত্ত জীবনের পরিচয় অঙ্কিত হয়েছে। 'ফেরারি ফৌজ'- এ মানবিক হৃদয় বৃত্তির মূল্য এবং দ্বন্দ্বজটিল জীবনের রস সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'অঙ্গার' নাটকে শিল্প পরিবেশ, দৃশ্যসজ্জার বিরাটত্ব, আলোকসম্পাতের চাতুর্য, সম্মিলিত জনতার ভাব ও অভিব্যক্তি অপূর্ব সার্থকতায় মন্ডিত হয়ে উঠেছে। পরিচ্ছন্ন চেতনা মর্মলব্ধ জীবনবোধ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে 'অঙ্গার' নাটক রচিত হয়েছে বাংলা নাট্যসাহিত্যে তা এক উজ্জ্বল সংযোজন। 'ঘুম নেই' একখানি নিখুঁত একাঙ্ক নাটক। এতে কতিপয় লরি ড্রাইভারের চলমান জীবনযাত্রার বাস্তব রূপ শিল্প-সম্মতভাবে ফুটে উঠেছে।[১৬]

বাংলা নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্র জগতে নবধারার পথিকৃৎ। তাঁর রচনার মধ্যে 'জ্বালা', 'সাঁকো', 'সেই মহিলা' একাঙ্কগুলি স্মরণীয় ।

নাট্যআন্দোলনের অন্যতম নাট্যকার গিরিশঙ্কর প্রথাগত ধ্যানধারণার পরিবর্তে স্বতন্ত্র পথের সন্ধানে রত। জীবনের খন্ডিত বোধের নবমূল্যায়নে তিনি গভীর ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর রচিত একাঙ্কিকা 'শেষ সংলাপ', 'এক চিলতে', 'রক্তকরবীর পর', 'রাজবাহার' সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

কিরণ মৈত্র, বীরু মুখার্জী, রমেন লাহিড়ী প্রায় একই ধারায় নাটক রচনা করেন। তবে এঁরা গঠনরীতিতে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। কিরণ মৈত্র মনস্তত্বমূলক নাটক রচনায় সিদ্ধি অর্জন করেছেন । 'অন্ধকারায় কোথায় গেল', ' বারো ঘন্টা' 'উৎসবের দিন', 'বুদবুদ', 'ভাগ্যে লেখা' নাটকগুলি বাংলা নাটকের স্থায়ী সম্পদ।

বীরু মুখার্জির 'দিনান্ত' মনোবিকলনগত সমস্যা-নির্ভর নাটক। 'সংক্রান্তি', 'রাহুমুক্তি', 'ভোরের স্বপ্ন' নাটকগুলি অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর। গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত এই নাট্যকারের জীবনভাবনা প্রগতিশীল বলিষ্ঠ চেতনার নিপুণতায় স্মরণীয়।

রমেন লাহিড়ীর 'অপরাজিত', 'শততম রজনীর অভিনয়' প্রভৃতি নাটকে জীবনের প্রতি উল্লাস, রসময় সংলাপ ও কাহিনী গ্রন্থনের অসামান্য নিপুণতা লক্ষ্য করা যায়। নবনাট্য আন্দোলনের অগ্রগণ্য গঙ্গাপদ বসু মঞ্চ ও চিত্রাভিনয়ের জগতে একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর অধিকাংশ নাটকের বক্তব্য শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে 'অংশীদার', 'সত্য মারা গেছে', 'নমো যন্ত্র', 'মহাগুরু নিপাত' উল্লেখযোগ্য।[১৭]

শৈলেশ গুহ নিয়োগী নাটকের ক্ষেত্রে একটি জনপ্রিয় নাম। এঁনার নাটকের উপজীব্য বিষয় সমাজের অসঙ্গতি। 'পলিটিক্স', 'ক্লু', 'গারদ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাটক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কয়েকটি একাঙ্ক নাটক রচিত হলো সেগুলির শিল্পমূল্য হয়তো নাট্যশাস্ত্রের বিচারে সম্পূর্ণ উন্নীত হতে পারেনি, কিন্তু বিষয়বস্তু, রচনারীতি ও প্রয়োগ কর্মের দিক থেকে সেগুলি নতুন দিক সূচিত করল। আধুনিক মানুষের জটিল মানস প্রতিফলিত হলো সোমেনচন্দ্র নন্দীর 'ছায়াবিহীন', 'সমান্তরাল', 'ছারপোকা', 'মূলধন' নাটকে। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য নাটক সৃষ্টি হয়েছে। 'নীচের মহল' খ্যাত উমানাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন 'জল', 'এন্টনি ফিরিঙ্গি'। জোছন দস্তিদার লিখেছেন 'দুই মহল', মনোরঞ্জন বিশ্বাস লিখেছেন 'আমার মাটি', মনোজ মিত্র লিখেছেন 'নীলকণ্ঠের বিষ','পাখির চোখ', ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরানির জীবন', 'স্ট্রীটবেগার', পরেশ ধরের 'শুধু ছায়া', 'ডানা ভাঙ্গা পাখি', পৃথ্বীশ সরকারের 'লবণাক্ত' স্মরণীয় অবদান । ধীরেন্দ্র দাসের 'গাঙ্গুলী মশাই', ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল', 'কানাগালি', দেবব্রত রায় চৌধুরীর 'সাগ্নিক', কানাই বসুর 'গৃহপ্রবেশ', সুনীল দত্তের 'হরিপদ মাস্টার', 'নিশির ডাক', হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনবর', সলিল চৌধুরীর 'অরুণোদয়ের পথে', বিনয় ঘোষের ল্যাবরেটরি, সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'কেরানি', 'ফসিল', মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি', অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যার রঙ', বিধায়ক ভট্টাচার্যর 'কান্নাহাসির পালা', 'উজান যাত্রা', গোপিকানাথ রায় চৌধুরীর 'নবজন্ম', 'দৈনন্দিন' প্রভৃতি নাটক অতি সার্থক।[১৮]

নবনাট্য আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য নাট্য বিষয় ও প্রকরণ বৈচিত্র্য। গণনাট্য ও নবনাট্য এই উভয় আন্দোলনের প্রভাব অনিবার্যভাবেই নাটকের বিবর্তনের ধারাকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে।

জীবনী নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে সহায়ক হয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম জীবনী নাটকের গৌরব "শ্রীমধুসূদন" খ্যাত বনফুলের। তাঁর "বিদ্যাসাগর"ও স্মরণীয় অবদান। অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রামমোহন' জীবনীও নাটকের ইতিহাসে অন্যতম অবদান। শৈলেন বসুর 'নেতাজী', সুনীল দত্তের 'বর্ণপরিচয়' এবং মন্মথ রায়ের "শ্রী শ্রীমা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে নাট্যকাব্যের অনুশীলনও এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে অতুলনীয় ছিলেন। 'মায়ার খেলা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'তাসের দেশ', 'চন্ডালিকা', 'শ্যামা' প্রভৃতি রচনা সংগীতবহুল হলেও মূলতঃ নাটকীয় রসপ্রধান কাব্য। এছাড়া দিলীপ রায়ের 'দুই আর দুই', রাম বসুর 'নীলকন্ঠ', গিরিশঙ্করের সমুদ্র, কৃষ্ণ ধরের 'একরাত্রির জন্য', কবি বুদ্ধদেব বসুর 'পাতা ঝরে যায়', 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' 'অনাম্নী অঙ্গনা' প্রভৃতি স্মরণীয় সৃষ্টি।

উপন্যাসের নাট্যরূপও বাংলা নাট্যজগতে নতুন নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের নাট্যরূপ বহুকাল ধরেই প্রচারিত হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসের সার্থক নাট্যরূপ আধুনিককালে দক্ষ অভিনয়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, বিমল মিত্র, বিমল কর প্রভৃতি প্রথিতযশা ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের নাট্যরূপও যথাযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে। অন্যান্য যেসব ব্যক্তিত্ব উপন্যাস ও গল্পের নাট্যরূপ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে যোগেশ চৌধুরী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শচীন সেনগুপ্ত, বীরু মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সেন, দেবনারায়ণ গুপ্ত, রাসবিহারী সরকার, অগ্নি মিত্র, সমর মুখার্জি অন্যতম। এঁদের মাধ্যমেই পেশাদারী মঞ্চ সফল আকার ধারণ করেছে।

পেশাদার নাট্যশালা ব্যতীত অপেশাদার নাট্যসংঘগুলিও যে জনচিত্ত জয়কারী অভিনয়ে সমর্থ তা নতুন করে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী গঠনের একপ্রকার জোয়ার এসে গেল বাংলায়। যুগসত্যকে রূপায়িত করে নাট্যকাররা সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ঘটনা, অন্যায়, প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে নাটক লিখতে শুরু করলেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে থিয়েটার সেন্টার প্রতিষ্ঠার পর থেকে অপেশাদার নাট্য সংস্থাগুলি নাটক প্রতিযোগিতা শুরু করে। একাঙ্ক অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বরূপা বা তৎকালীন শ্রীরঙ্গম মঞ্চটি স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সুরকার সলিল চৌধুরী 'অরণোদয়ের পথে' নাটিকায় আধুনিক জীবনবাণীর রূপায়ণে সচেষ্ট হন। ১৯৬০ সাল থেকে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা শুরু করে। এযাবৎকাল পর্যন্ত বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী অত্যন্ত সংবেদনশীলতা ও সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই নাটক প্রতিযোগিতা ও নাট্যোৎসবের আয়োজন করতেন। সুধী দর্শকবৃন্দ তা সাদরে গ্রহণও করেছিলেন। এমনকি শুধু কলকাতা বা শহরাঞ্চল নয়, সুদূর মফস্বলের নাট্যমোদী দর্শকবৃন্দও তার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। প্রতিবেশী রাজ্য এমনকি বিদেশ থেকেও নাট্যগোষ্ঠী তাদের নাট্য প্রযোজনা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন।[১৯]

বাংলা নবনাট্য আন্দোলনে সর্বাগ্রগণ্য 'বহুরূপী' নট-নাট্য পরিচালক ও নাট্যকার শম্ভু মিত্র এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। 'নবান্ন' নাটকের তিনিই ছিলেন পরিচালক। 'বহুরূপী'র কর্ণধার রূপে তিনি তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার', 'পথিক' ইত্যাদি নাটক প্রযোজনা করেছেন। তাঁর রচিত ও অভিনীত 'উলুখাগড়া', 'ঘূর্ণি' ও 'চাঁদ বণিকের পালা' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। সরাসরি রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের পরিবর্তে সমাজবাস্তবতার পাতায় ছবিটি সূক্ষ্ম ও মনোগ্রাহী কারুকলায় ফুটিয়ে তোলাতেই তাঁর আগ্রহ বেশি বলে মনে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙালি মধ্যবিত্তের দুরবস্থাও তার নাটকের বিষয়বস্তু হয়েছে। ইবসেনীয় নাট্যাদর্শে বিশ্বাসী শম্ভু মিত্র ইবসেনের 'ডলস হাউস' ও 'ঘোস্ট' রূপান্তরে যথাক্রমে 'পুতুল খেলা' ও 'দশচক্র' নামে অভিনীত হয়েছে বহুরূপীর দ্বারা। এছাড়াও তাঁর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' ও 'ডাকঘর' অত্যন্ত মর্মগ্রাহী নাট্য অভিনয়ে পরিগণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন যে, শুধু শম্ভু মিত্র নিজেই নন, তাঁর স্ত্রী তৃপ্তি মিত্র ও সুযোগ্যা কন্যা শাঁওলী মিত্রও নাটক প্রযোজনা ও অভিনয়ে সক্রিয় প্রতিভার স্বাক্ষর

রেখেছেন। শাঁওলী মিত্রের নিজস্ব সংস্থা 'পঞ্চম বৈদিক' নিবেদিত 'নাথবতী অনাথবৎ' নাটকটি মহাভারতের পাঞ্চালি তথা দ্রৌপদীর মর্মবেদনা একক অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। অকালপ্রয়াতা অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তীর নামও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। অতি সম্প্রতিকালে বাংলা নাটকে জার্মান লেখক ব্রেশটের এপিক থিয়েটারের প্রভাব দেখা যায়। তেমনই ইউরোপীয় অ্যাবসার্ড ড্রামার প্রভাবে বাংলা উদ্ভটনাট্য বা 'কিমিতি' নাটকেরও লক্ষণীয় প্রসার লাভ ঘটেছে সাম্প্রতিক সময়ে। কিমিতি বা উদ্ভট নাট্যধারার অন্যতম নাট্যকার হলেন বাদল সরকার। তাঁর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' বিখ্যাত নাটক। কিমিতিবাদের প্রধান লক্ষণ হল 'তাৎপর্যহীনতা ও অপরিণামিতা'। এটি 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাদল সরকারের অন্যান্য নাটক 'বাকি ইতিহাস', 'প্রলাপ', 'ত্রিংশ শতাব্দী' ও 'পাগলা ঘোড়া' বহুরূপীর দ্বারা সার্থকভাবে অভিনীত হয়েছে।

বাংলা কিমিতিবাদী নাট্যধারার আরেকজন খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যকার হলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নাটকগুলি হল 'মৃত্যু সংবাদ', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড', 'রাজরক্ত', 'পুষ্পক রথ', 'নিষাদ', 'দ্বীপের রাজা', 'বাজপাখি ও ক্যাপ্টেন হুররা' ইত্যাদি। তবে তাঁর নাটকগুলিকে সম্পূর্ণ কিমিতি নাটক বলা যায় না। বরং বলা যায়, এই সব নাটক ভাবনা প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক বা রূপকধর্মী নাটকের কাছেই ঋণী। বর্তমান জীবনের কঠিন সংকটগুলিকে নানা সংকেতে গভীর অর্থবহ করে প্রকাশের চেষ্টাই এই নাটকগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। আণবিক বোমার বিধ্বংসী লীলাকেও নাটকের বিষয়বস্তু করেছেন তিনি। 'দ্বীপের রাজা' এদিক দিয়ে একটি বিশিষ্ট নাটক। আবার এই ধারাতেই খ্যাতি অর্জন করেছেন রতন কুমার ঘোষ। তাঁর 'শেষ বিচার', 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে' নাটকগুলি কাল্পনিকতার বিচারে অতুলনীয়। ব্রেশটীয় ভঙ্গিতে জীবনের অব্যবস্থিত অবস্থার চিত্র উপস্থিত করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'এ সময় উত্তাল সময়' নাটকে। তাঁর 'তিন পয়সার পালাও' অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নাটক।

মানুষের মনের নানা জটিল কামনার নাট্যরূপ সংকেতে ও কাব্যময় সংলাপের অর্থবাহী করে তুলেছেন কয়েকজন নাট্যকার। তাঁদের মধ্যে মনোজ মিত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'নীলকণ্ঠের বিষ', 'তক্ষক', 'কামধেনু', 'চাক ভাঙ্গা মধু', 'সাজানো বাগান', 'কমলাকান্তের দপ্তর' ইত্যাদি সমাজের ক্লেদ ও ক্লেদমুক্তির শক্তি-দুইয়েরই যথাযথ চিত্র উপস্থাপিত করেছে।

বাংলা নাটকে বিদেশি নাটকের অনুবাদের বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে শেক্সপিয়রের প্রভাব সর্বাধিক ভাবে পরিচিত। শেক্সপিয়রের মূল ইংরেজি নাটকগুলির অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁর বিভিন্ন নাটক অনুবাদ করা হয়েছিল যদিও তা সেভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩) ও 'চারুমুখ চিত্তহরা' (১৮৬৩)। প্রথমটি 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' এর ভাবানুবাদ ও দ্বিতীয়টি 'রোমিও এন্ড জুলিয়েট' এর ভাবানুবাদ। এছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত 'সিম্বেলাইন' এর অনুবাদ

'বীরসিংহ', হরলাল রায়ের 'ম্যাকবেথ' এর রূপান্তর 'রুদ্রপাল' ইত্যাদি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদ করেছিলেন 'জুলিয়াস সিজার', গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'ম্যাকবেথ', দেবেন্দ্রনাথ বসু 'ওথেলো'। স্বয়ং বিদ্যাসাগর 'দ্য কমেডি অফ এররস' অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯), প্রমথনাথ বসু লিখেছিলেন 'হ্যামলেট' অবলম্বনে 'অমরসিংহ' নাটকটি। ১৮৭৫ সালে চন্দ্রকালি ঘোষ 'সিম্বেলাইন' অবলম্বনে 'কুসুমকুমারী' নাটকটি লেখেন ও সেটি ১৮৭৫ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। এভাবেই পাত্র-পাত্রীদের নাম, বেশভূষা, কথাবার্তার পার্থক্য দ্বারা দেশীয় পাঠক দর্শকদের কাছে শেক্সপিয়রের নাট্যসম্পদকে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন বাঙালি নট ও নাট্যকারেরা। বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক নাট্যকার মধুসূদনের ওপর শেক্সপিয়রের প্রভাব তেমন প্রত্যক্ষভাবে না হলেও 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে তিনি পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুসরণ করেছেন। 'পদ্মাবতী'তেও সেই প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তবে 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্র ও ট্রাজিক বেদনায় শেক্সপিয়রের নাটকের সত্তাটি যথার্থ রূপে প্রতিষ্ঠিত ।[২০]

দীনবন্ধু মিত্র এবং বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের শেক্সপিয়রের নাটকের প্রতি আকর্ষণ ও প্রভাব অনস্বীকার্য। শেক্সপিয়রের নাট্য-কাঠামোকে দেশীয় কাহিনীর আধারে রচনা করেছেন। কয়েকটি বিশেষ নাট্যকৌশলও গিরিশচন্দ্র ব্যবহার করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকগুলির ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল শেক্সপিয়রের নাট্যরীতি। তাঁর 'সাজাহান', 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মেবার পতন' নাটকগুলিতে ঘটনার তীব্র গতিবেগ, নাট্যোৎকণ্ঠা চরিত্রসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্বজর্জর ট্রাজিক সত্তা, সংলাপ ও পরিস্থিতির নির্মাণ দক্ষতায় দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাট্যসাহিত্যে শেক্সপিয়রের যোগ্য উত্তরাধিকারী।

কলকাতার রঙ্গমঞ্চে শেক্সপিয়রের নাটকের অভিনয় বাঙালির বিনোদন তথা সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত রঙ্গালয় দি নিউ প্লে হাউস- এ শেক্সপিয়রের 'দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস', 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ', ' রিচার্ড দি থার্ড', 'ওথেলো', 'কিং লিয়র' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হয়েছিল এমন তথ্য জানা গেছে। অভিনেতারা সকলেই ছিলেন অপেশাদার এবং পুরুষরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। কলকাতার বিদেশি রঙ্গালয়ের মধ্যে বিশেষভাবে খ্যাত চৌরঙ্গী থিয়েটারে ১৮১৪ থেকে অভিনীত হয়েছিল 'ম্যাকবেথ', 'হেনরি দি ফিফ্‌থ'। ১৮৩৯-এ প্রতিষ্ঠিত "সাঁ সুসি"থিয়েটারে অভিনয় করা হয়েছিল 'দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস', পরে 'রোমিও এন্ড জুলিয়েট', 'ওথেলো', 'ম্যাকবেথ', 'হ্যামলেট', 'জুলিয়াস সিজার' নাটকগুলিও প্রদর্শিত হয়েছিল।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শেক্সপিয়রের নাটক অভিনয় ও আবৃত্তির উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। হেনরি ডিরোজিও নিজে এবং পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে শেক্সপিয়রের নাটক অভিনয় করেন। ১৮৫২-৫৩ সাল থেকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, মেট্রোপলিটন একাডেমী ও ডেভিড একাডেমির ছাত্ররা শেক্সপিয়রের নাটকে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ১৮৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার এ দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে অভিনীত হয় 'জুলিয়াস সিজার'। ঊনিশ শতকের শেষ দিক থেকে শখের অভিনয়ের পাশাপাশি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে শেক্সপিয়রের নাটক অভিনীত হতে শুরু হয় 'মিনার্ভা' ও 'স্টার' এর মত বাণিজ্যিক থিয়েটারে। তাছাড়া 'ম্যাকবেথ', 'এন্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা', 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস', 'ওথেলো' ইত্যাদি জনচিত্তজয়ী নাটকের বাংলা অনুবাদ করে কলকাতা ও মফস্বলের বহু জায়গায় নাটক অভিনীত হয়েছে।

১৮৯৯-১৯০০ সালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে একটি নাট্যগোষ্ঠী গঠিত হয় এবং এই সংস্থাটি 'ম্যাকবেথ', 'টুয়েলভথ নাইট', 'জুলিয়াস সিজার' প্রভৃতি নাটক অভিনয় করেন। কলকাতার মঞ্চে এসব অভিনয়ের সূত্রেই প্রতিভাবান অভিনেতারূপে পরিচিত হয়েছিলেন শিশির কুমার ভাদুড়ী ও নরেশ মিত্রের মতো নাট্যব্যক্তিত্ব।

কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের অঙ্গনে শেক্সপিয়রের নাটক অভিনীত হয়েছে বহুবার। এ বিষয়ে কৃতিত্বের অধিকারী যশস্বী অভিনেতা উৎপল দত্ত। তাঁরই চেষ্টায় বাংলা ও ইংরেজিতে মঞ্চস্থ হয়েছে 'রিচার্ড দ্যা থার্ড', 'মেরি ওয়াইভস অফ উইন্ডসর', 'ওথেলো', 'দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস' ইত্যাদি নাটক। এছাড়া 'আ মিড সামার নাইটস ড্রিম' অবলম্বনে 'চৈতালি রাতের স্বপ্ন' নাটকটিও মঞ্চস্থ হয়। অন্যান্য নাট্যগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে শেক্সপিয়ারকে আশ্রয় করে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। সম্প্রতি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত ও অভিনীত 'কিং লিয়র' নাটকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

শেক্সপিয়র ছাড়া যে সব বিদেশী নাট্যকারের নাম বাংলায় অনূদিত ও অভিনীত হয়েছে তার মধ্যে ইবসেন, গোর্কি, আনতন চেকভ, পিরানডেল্লো, সফোক্লেস, ব্রেশট ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থা অভিনয় করেন 'দশচক্র' (ইবসেন), 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাংকে' (চেকভ), 'পুতুল খেলা' (ইবসেন), 'রাজা অয়দিপাউস' (সফোক্লেস)। 'শৌভনিক' প্রযোজিত নাটক 'মা' (গোর্কি), 'গোষ্টস' (ইবসেন), নান্দীকার কর্তৃক অভিনীত 'মঞ্জরি' আমের মঞ্জরি' (চেকভ), 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' (পিরানডেল্লো), 'ইঁদুর কল' (আগাথা ক্রিস্টি) ইত্যাদি।[২১]

বাংলা নাটকের বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর অবদান কম উল্লেখযোগ্য নয়। নাটক নির্বাচন ও প্রযোজনায় এদের রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষণীয়। এই নাট্যগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনায় যাঁরা কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন 'সাজানো বাগান' খ্যাত সুন্দরম (মনোজ মিত্র), 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'

(বিভাস চক্রবর্তী), 'স্বপ্নসন্ধানী' (কৌশিক সেন), 'হারকিউলিস' (সুমন মুখোপাধ্যায়), শূদ্রক, নটসেনা, শৌভনিক, শৈশিরিক, থিয়েটার সেন্টার, নান্দীমুখ, ব্রাত্যজন, কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্র, যোজক। এর মধ্যে সফল প্রযোজনা 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' ও দেবেশ রায়ের 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' সমধিক প্রসিদ্ধ নাটক। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অভিনীত 'আন্তিগোনে' সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'কিং লিয়র' জীবন-অনুবাদ নাটকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রতিবেশী রাজ্যের নাটকগুলিও বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে বাংলা নাট্য সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছে। এর মধ্যে রমেশ মেহতা অগ্নিহোত্রীর নাটক, গান্ধর্ব বলবন্ত গার্গীর নাটক, রাজা সাজা গোষ্ঠীর নাটক, মৈথিলী নাট্যকার গণনাথ ঝার নাটক, গিরিশ কারনাড এর[২২] নাটক বিভিন্ন সময়ে মঞ্চস্থ হয়েছে। সম্প্রতি ঊষা গাঙ্গুলি মারাঠি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন- 'ঘাসিরাম কোতোয়াল', 'চোপ আদালত চলছে', 'চরণদাস চোর' ইত্যাদি। প্রতিবেশী বাংলাদেশের নাটকও পশ্চিমবঙ্গের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। নাট্যজগতের উন্নতিসাধনে ও সাধারণ মানুষের মধ্যে নাট্য আন্দোলন ও সুস্থ সংস্কৃতি রুচির পরিবেশনের জন্য বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী ও সরকার যথেষ্ট যত্নশীল। তাই প্রত্যেক বছর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ও কলকাতায় নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়। এই নাটকের মাধ্যমে যেমন বিনোদনের চাহিদা পূরণ করা হয় তেমনি নাটকের বিভিন্ন আঙ্গিক, শিল্প সৌকর্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং দর্শক সাধারণের মধ্যে আনন্দ দানের মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতির পরিচয় ঘটে। এখানেই নাটকের সার্থকতা। বাংলা নাটকের ক্রমানুক্রমিক বিবর্তন তাই ধারাবাহিকভাবে চলেছে ও চলবে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিবর্তন ধারায় একাঙ্ক নাটক যুগচিহ্ন কণ্টকিত মানসিক সমস্যা প্রকাশে স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে। নাট্য সাহিত্য বা মঞ্চে নাটক পরিবেশন-দুভাবেই বাংলা নাটক সমৃদ্ধ হয়েছে। কেবলমাত্র সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণার বস্তুভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রবণতাই যে সাম্প্রতিক নাট্য সাহিত্য বা নাট্যকলায় বিবৃত হয়েছে তা নয়, এই ধারার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতি ও সংস্কৃতির একটি পূর্ণ স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় । জীবনের নানা দিক বিশ্লেষণ করে বিরাট অপচয় ও ব্যাপক অবক্ষয়ের যে চিত্রটি আজকের নাট্য রচয়িতা বা নাট্যকাররা উদঘাটনে প্রয়াসী তার বিচার বিগতকালের নাট্য সমালোচনার মাপকাঠিতে আংশিকভাবে সম্ভব হলেও আজকের নাটকের সঠিক মূল্যায়ন করা প্রায় অসম্ভব। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের নাট্য ঐতিহ্যের লব্ধ অভিজ্ঞতা যখন স্বাধীনতা পরবর্তীকালের নতুনতর আশা-আকাঙ্ক্ষা আদর্শবাদে নতুন রূপ পরিগ্রহ করল, তখন দেশে সামাজিক পরিবেশের যে চিত্রটি ছিল তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। জীবনের নব-মূল্যায়ন, মানব চেতনার বিশ্লেষণ ও বিবর্তন আধুনিক নাটকের চলচ্ছবি। এইভাবেই নাটকের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবনের বৈচিত্র্য ও রসের বিভিন্নতার পথসন্ধান অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। শুধু মালিক-শ্রমিক বিরোধ নয়, ব্যক্তিগত জীবন-সমস্যা নয়, সামগ্রিক জীবনের নানা দ্বন্দ্ব ও সমস্যাই বর্তমান নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চস্থ নাটকে রূপায়িত হচ্ছে। সাহিত্যের

সবচেয়ে জীবনঘনিষ্ঠ বাহন হলো নাটক, বর্তমান নাটকগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে তা সত্য বলেই মনে হয়। তবে এই সমস্ত নাট্যরূপ সাহিত্য বা নাটকের মূল্য বিচার করবে ভাবীকাল। এখানেই নাটকের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ।

গ্রন্থসূত্র:-

১)বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, পৃষ্ঠা ২৫৫

২) মুখোপাধ্যায়, সুমন, পৃষ্ঠা ৯-১৮

৩) দত্ত, উৎপল, পৃষ্ঠা ২০-৪৮

৪) সেন, সুকুমার, পৃষ্ঠা ৬২

৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত , পৃষ্ঠা ১৪

৬) ঘোষ, অজিত কুমার, পৃষ্ঠা ৩৭-৪৮

৭) বসু, স্বপন, পৃষ্ঠা ১-৪৭

৮) বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ কুমার, পৃষ্ঠা ২৮-৪৮

৯) ভট্টাচার্য, বিজন, পৃষ্ঠা ১-২৪

১০) রায়, মন্মথ, পৃষ্ঠা ১-১৬

১১) মজুমদার, প্রতীপ, পৃষ্ঠা ১৮২

১২) বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, পৃষ্ঠা ১-৪৮

১৩) ঘোষ, শঙ্খ, পৃষ্ঠা ১৬-৪২

১৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার , পৃষ্ঠা ১-২৪

১৫) মিত্র, সনৎ কুমার, পৃষ্ঠা ১০-২৫

১৬) দত্ত, উৎপল, পৃষ্ঠা ২০-৪৭

১৭) বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, পৃষ্ঠা ৬-৫২

১৮) মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র ,পৃষ্ঠা ১৮-২২

১৯) বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিৎ, পৃষ্ঠা ৬১-৬৭

২০) চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, পৃষ্ঠা ১০৬-১১৮

২১) তদেব, পৃষ্ঠা ৪৬-৬৮
২২) দাস, প্রভাতকুমার, পৃ.৬-২২

গ্রন্থপঞ্জী :-

১) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা* ।কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৭৪।

২) মুখোপাধ্যায়, সুমন। *মঞ্চচিত্রের বৃত্তান্ত।* কলকাতা, দে'জ পাবলিশার্স, ২০২২।

৩) দত্ত, উৎপল। *গিরিশ প্রতিভা।* দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪।

৪) সেন, সুকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।* পঞ্চম খন্ড, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬২।
৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত। *বাংলা থিয়েটারের গান।* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭।
৬) ঘোষ, অজিত কুমার। *বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস।* মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮১।

৭) বসু, স্বপন। *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস।* পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ২০২২।

৮) বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ কুমার। *দাঙ্গার ইতিহাস।* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২২।

৯) ভট্টাচার্য, বিজন। *বিজন ভট্টাচার্য নাট্য সংগ্রহ।* পত্রভারতী, কলকাতা, ১৯৮৭।

১০) রায়, মন্মথ। *কারাগার।* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০২২।
১১) মজুমদার, প্রতীপ। *পরিমল গোস্বামীঃ জীবন ও সাহিত্য।* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৭।
১২) বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। *নাট্য সমগ্র।* দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২।

১৩) ঘোষ, শঙ্খ। *থিয়েটারের কথা গ্রন্থণ।* দেবাশীষ মজুমদার, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০২২।

১৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।* মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৪ ।

১৫) মিত্র, সনৎ কুমার। *সাহিত্য টীকা।* পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ২০০৯।

১৬) দত্ত, উৎপল। *উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ।* দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২২।

১৭) বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক। *থিয়েটারের জল হাওয়ায়।* প্যাপিরাস , কলকাতা, ২০২২।

১৮) মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র। *রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর।* পত্রভারতী, কলকাতা, ১৯৯২।

১৯) বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিৎ। *রঙ্গালয় বাণিজ্যকরণের দেড়শো বছর।* দেশ পত্রিকা ২ জানুয়ারি ২০২৩, কলকাতা, ২০২৩।

২০) চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। *ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস।* রত্নাবলী, কলকাতা,১৯৯৮।

২২) দাস, প্রভাতকুমার। সম্পাদিত, *বাংলা রঙ্গমঞ্চে গিরিশ কারনাড।* একুশ শতক, কলকাতা,২০২২।